

মো: মামুন হাসান

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় সমুদ্র আজ এক নতুন সম্ভাবনার নাম। দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং উপকূলীয় লাঞ্ছনা মানুষের জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বঙ্গোপসাগর। প্রায় ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং ৩৭০ কিলোমিটার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার ইকোনমিক জোন নিয়ে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের জন্য এক অমূল্য সম্পদভান্ডার। এই বিশাল জলরাশি শুধু মাছের আধার নয়; বরং দেশের সুনীল অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য বলছে সাগর অর্থনীতিকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ বছরে ৬.২ বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে। বিশাল সাগর এলাকা নয়, জীববৈচিত্র্যকে কাজে লাগাতে আমাদের যুগোযোগী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বর্তমান সরকার এ লক্ষ্যে কাজ করছে। সুনীল সাগরে তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ যেমন রয়েছে তেমনি জাহাজ শিল্পের সম্ভাবনাও অনেক। তবে এক্ষেত্রে পরিবেশগত বিষয়গুলো মাথায় রেখেও কাজ করা খুবই জরুরি।

আমাদের সামুদ্রিক সম্পদ সীমাহীন নয়। দীর্ঘদিনের অতিরিক্ত আহরণ, প্রজনন মৌসুমে নির্বিচারে মাছ শিকার, পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এখন সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে উঠেছে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ সরকার একদিকে যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করছে, অন্যদিকে মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ রাখার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

দেশে প্রথমবারের মত ২০১৫ সালে বঙ্গোপসাগরে ৬৫ দিনের জন্য বাণিজ্যিক ট্রলারের মাছ ধরা বন্ধ করা হয়। পরে ২০১৯ সাল থেকে সকল ধরনের মৎস্য নৌযানের জন্য নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়। এসময় বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফলে সীমান্তবর্তী এলাকায় মাছ সংরক্ষণের সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছিল না। এ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০২৫ সাল থেকে নিষেধাজ্ঞার সময় পরিবর্তন করে ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮ দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সব ধরনের মৎস্য নৌযান কর্তৃক যেকোনো প্রজাতির মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়।

নিষেধাজ্ঞা সফল করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় শুধু আইন প্রয়োগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং জেলেদের সামাজিক সুরক্ষা ও জনসচেতনতাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চট্টগ্রাম মহানগরীসহ চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ১৪টি উপকূলীয় জেলার ৬৭টি উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৬০টি টাস্কফোর্স কমিটির সভা ও ২৬০টি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যানার ও পোস্টার স্থাপন এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়।

নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ও সফল করতে সরকার জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কঠোর আইন প্রয়োগ- এই দুই কৌশল সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করেছে। নিষেধাজ্ঞাকালীন জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় ১৪টি জেলার ৬৯টি উপজেলায় দেশের ৩ লাখ ১২ হাজার ৫০০ মৎস্যজীবী পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৫৮ দিনে ২৪ হাজার ১৬৫ মেট্রিক টনেরও বেশি ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে। এ সহায়তা জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে উৎসাহিত করেছে এবং জীবিকার প্রয়োজনে অবৈধভাবে মাছ ধরার প্রবণতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অন্যদিকে, আইন প্রয়োগ জোরদার করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে ৫৮ দিনে ৩ হাজার ৫০২টি অভিযান এবং ৫৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এসব অভিযানে ১ হাজার ১৯০ মেট্রিক টনেরও বেশি মাছ এবং ৫৪৩ লাখ মিটারেরও বেশি অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা, অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি সামুদ্রিক সম্পদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ কোনো সম্পদের পরিমাণ, বিস্তৃতি এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য ছাড়া কার্যকর ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। এই প্রয়োজন পূরণে ২০২৫ সালে পরিচালিত হয়েছে আরভি ডি. ফ্রিটজফ ন্যানসেন জরিপ, যা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্তর্জাতিক জরিপে বাংলাদেশ, নরওয়ে, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের গবেষক, সমুদ্রবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বখ্যাত গবেষণা জাহাজ ড. ফ্রিটজফ ন্যানসেনের মাধ্যমে পরিচালিত এ জরিপে আধুনিক হাইড্রো- অ্যাকুস্টিক প্রযুক্তি, পেলাজিক ও বটম ট্রলিং, প্ল্যাঙ্কটন স্যাম্পলিং, সমুদ্র বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্রপাতি এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মাছের মজুদ, প্রজাতিবৈচিত্র্য, প্রজনন সম্ভাবনা, পরিবেশগত অবস্থা এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল মাছের প্রকৃত মজুদ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব। ন্যানসেন জরিপ সেই তথ্যঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করেছে। জরিপে ৩২টি প্ল্যাঙ্কটন স্টেশন থেকে সংগৃহীত নমুনা বিশ্লেষণ করে ৯ হাজার ৭৯৪টি মাছের লার্ভা শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে টুনা ও টুনা জাতীয় মাছের লার্ভার উপস্থিতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি বঙ্গোপসাগরে টুনা মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, নার্সারি গ্রাউন্ড এবং বিস্তৃতির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

আরও আশাব্যঞ্জক তথ্য হলো, স্কিপজ্যাক টুনা মাছ ট্রল এবং হুক-অ্যান্ড-লাইন উভয় পদ্ধতিতে ধরা পড়েছে। একই সঙ্গে গবেষকরা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার ভেতরে টুনার ঝাঁকও প্রত্যক্ষ করেছেন। মৎস্য বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই তথ্য ভবিষ্যতে টুনাভিত্তিক মৎস্যশিল্প ও রপ্তানি আয়ের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। তবে জরিপে উঠে এসেছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- সমুদ্রে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের উপস্থিতি। ম্যান্টা ট্রল ব্যবহার করে পরিচালিত মাইক্রোপ্লাস্টিক বিশ্লেষণে ৪১৮টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা শনাক্ত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাইক্রোপ্লাস্টিক সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে মাছসহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব মানবস্বাস্থ্যের উপরও পড়তে পারে। ফলে সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ এখন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

ন্যানসেন জরিপের সবচেয়ে আলোচিত অর্জনগুলোর একটি হলো বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান। গবেষকরা ট্রল পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ৩০০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও সংশ্লিষ্ট জীবের নমুনা সংগ্রহ করেছেন এবং প্রায় ৭৫০টি উচ্চমানের আলোকচিত্রের মাধ্যমে সেগুলো নথিভুক্ত করেছেন। প্রাথমিক বিশ্লেষণে অন্তত ৬৫টি প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুন রেকর্ড হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঁচটি প্রজাতি বিজ্ঞান জগতের জন্য সম্পূর্ণ নতুন হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরবর্তী গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য গবেষণায় একটি ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সমুদ্রকে যদি প্রজননের জন্য কিছুটা সময় দেওয়া যায়, তাহলে সেই সমুদ্রই পরবর্তীতে বহুগুণ বেশি সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। আটান্ন দিনের মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা এবং ন্যানসেন জরিপের ফলাফল সেই সত্যকেই নতুন করে সামনে এনেছে।

একদিকে মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করা, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সম্পদের প্রকৃত অবস্থা জানা- এই দুই উদ্যোগের সমন্বয়ই টেকসই সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি। বঙ্গোপসাগরের সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করতে চায়, ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা এবং ন্যানসেন জরিপ তারই সফল ও দূরদর্শী উদাহরণ।

আগামী দিনের বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হতে পারে সমুদ্র। আর সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, সম্পদ সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীল আহরণের বিকল্প নেই।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার